তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। এটি মানবজাতির জন্য একটি বিশেষ নিয়ামত। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা এটি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাজিল করেছেন। আর নবি করিম (স.) আমাদের নিকট এ পবিত্র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ নিজে আমল করে তিনি আমাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মানুষের নিকট এ বাণীর মর্ম ও তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এ সমস্ত বাণী ও কর্মকে বলা হয় হাদিস। হাদিস আল-কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। ইসলামি বিধি-বিধান পূর্ণরূপে পালন করার জন্য আল-কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আল-কুরআনের পরিচয় ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল-কুরআনের অবতরণ, সংরক্ষণ ও সংকলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- মাদ্দ ও ওয়াক্‌ফসহ তাজবিদ অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে পারব।
- আল–কুরআনের নির্বাচিত পাঁচটি সূরা অর্থসহ মুখস্থ বলতে ও মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নির্বাচিত সূরাগুলোর পটভূমি (শানে নুযুল) ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক (প্রার্থনামূলক) তিনটি আয়াত অর্থসহ বলতে পারব।
- হাদিসের গুরুত্ব ও সিহাহ সিত্তার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী নৈতিক জীবনযাপনের উপায় চিহ্নিত করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস অর্থসহ বলতে পারব।
- নৈতিক গুণাবলিবিষয়ক তিনটি হাদিস অর্থসহ বলতে পারব।
- হাদিসের আলোকে মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হাদিসের আলোকে মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতামূলক আচরণগুলো চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ১

কুরআন মজিদ

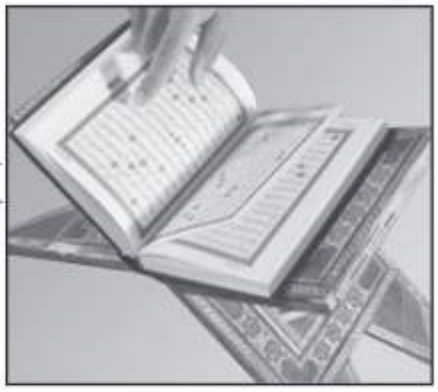

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। এটি মুসলিমগণের ধর্মগ্রন্থ। কুরআন মজিদ বরকতময় গ্রন্থ। মানুষের প্রতি এটি আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এটি নাজিল করেন। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষে নাজিল করা হয়েছে। এরপর আর কোনো কিতাব আসেনি। আর ভবিষ্যতেও আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের বিধি-বিধান ও শিক্ষা বলবৎ থাকবে। এটি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হিদায়াতের উৎসস্বরূপ। আল-কুরআনের নির্দেশনা মেনে চললে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি ও সম্মান পাবে। আর আখিরাতে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

অর্থ : "এই কিতাব আমি নাজিল করেছি, যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।" (সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৫)

অবতরণ

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাজিল করেন। আল-কুরআন 'লাওহে মাহফুয' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। 'লাওহে মাহফুয' অর্থ সংরক্ষিত ফলক। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

অর্থ : "বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত ২১-২২)

লাওহে মাহফুয থেকে আল-কুরআন প্রথমে কদরের রাতে প্রথম আসমানের 'বায়তুল ইয্যাহ' নামক স্থানে একসাথে অবতীর্ণ হয়। এটি ছিল রমযান মাসের লাইলাতুল কদর বা মহিমান্বিত রাত। আমরা এ রাতকে শবে কদরও বলে থাকি। এরপর প্রথম আসমান থেকে অল্প অল্প করে পুরো কুরআন মজিদ প্রিয় নবি (স.)-এর উপর নাজিল করা হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। তিনি আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় গোটা আরব ছিল অজ্ঞতা ও বর্বরতায় আচ্ছন্ন। তারা নানা মূর্তির পূজা করত। নানারূপ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করত। ঐতিহাসিকগণ সে সময়কে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' নামে আখ্যায়িত করেছেন। আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ।

নবি করিম (স.) আরবদের এরূপ অজ্ঞতা ও বর্বরতা পছন্দ করতেন না। তিনি সবসময় সত্য ও সুন্দরের অনুসন্ধান করতেন। এজন্য তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই তাঁর নিকট সর্বপ্রথম কুরআনের বাণী নাজিল হয়। তিনি সত্যের সন্ধান পান। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে মনোনীত করেন। এ সময় মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ.) সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন। এটিই ছিল সর্বপ্রথম ওহি। এরপর মহানবি (স.) আরও ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর **জীবদ্দশায় আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজন অনুসারে আল-কুরআনের বিভিন্ন অংশ অল্প অল্প করে নাজিল করেন। এভাবে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে আল-কুরআন সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়।**

আল–কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি সংরক্ষণ করার দায়িত্বও তারই। তিনি স্বয়ং আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ

অর্থ : "নিশ্চয়ই এর (আল-কুরআন) সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।"(সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত ১৭)

আল্লাহ আরও বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক।"(সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

আল-কুরআনের সংরক্ষক স্বয়ং মহান আল্লাহ। এজন্য আজ পর্যন্ত এটির কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি। আর ভবিষ্যতেও হবে না। এটি সকল প্রকার পরিবর্তন হতে মুক্ত। কেউ এতে নতুন কোনো কিছু সংযোজন করতে পারে না। আবার এর থেকে কোনো কিছু বাদও দিতে পারে না। আল-কুরআনের প্রতিটি হরকত, নুকতা, শব্দ, বাক্য সবকিছুই অপরিবর্তিত।

আল–কুরআন সংরক্ষণ

আল-কুরআন সর্বপ্রথম হিফয করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। হিফয হলো মুখস্থ করা। যাঁরা পবিত্র কুরআন হিফয করেন তাঁদেরকে বলা হয় হাফিয। আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তারা খুব সহজেই নানা জিনিস স্মরণ রাখতে পারত। সম্ভবত আল-কুরআন মুখস্থ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের এরূপ স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। কুরআন মজিদের কোনো অংশ নাজিল হলে সর্বপ্রথম মহানবি (স.) তা নিজে মুখস্থ করে নিতেন। এরপর তা সাহাবিগণকে মুখস্থ করতে বলতেন। মহানবি (স.)-এর উৎসাহ ও নির্দেশে সাহাবিগণ আল-কুরআন মুখস্থ করে রাখতেন। এভাবে কুরআন মজিদ স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন লেখনীর মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা হয়। কুরআনের কোনো অংশ নাজিল হলে তা মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখে রাখার জন্যও নবি করিম (স.) নির্দেশ দিতেন। যে সকল সাহাবি লিখতে জানতেন তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁদের বলা হয় কাতেবে ওহি বা ওহি লেখক। এঁদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। প্রধান ওহি লেখক সাহাবি ছিলেন হযরত যায়দ ইবনু সাবিত (রা.)। ওহি লেখক সাহাবিগণ সর্বদা নবি (স.)-এর সাথে থাকতেন। কুরআনের কোনো অংশ নাজিল হলে তাঁরা সাথে সাথেই তা লিখে রাখতেন। সে সময় আজকের ন্যায় কাগজ কিংবা কম্পিউটার ছিল না। তাই তখন কুরআন মজিদ খেজুর গাছের ডাল, পশুর হাড়, চামড়া, ছোট ছোট পাথর ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো। এভাবেও কুরআন মজিদ সংরক্ষণ করা হয়।

আল–কুরআন সংকলন

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়। ফলে সে সময় গ্রন্থাকারে তা সংকলন করা হয়নি। বরং সে সময় হিফয ও লেখনীর সাহায্যে আল-কুরআনকে সংরক্ষণ করা হয়। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর আল-কুরআন সংকলন করা হয়।

মহানবি (স.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা মনোনীত হন। সে সময় কতিপয় ভণ্ড নবির আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবু বকর (রা.) সেসব ভণ্ড নবির বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। এ রকমই একটি যুদ্ধ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ভণ্ড নবি মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করেন। তবে কুরআনের বহুসংখ্যক হাফিয শাহাদতবরণ করেন। এ অবস্থা দেখে হযরত উমর (রা.) ভাবলেন- কুরআনের হাফিযগণ এভাবে ইন্তিকাল করলে এর অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে কুরআন সংকলন করার পরামর্শ দেন। হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শ শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.)-কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশে হযরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.) সাহাবিদের নিকট সংরক্ষিত কুরআনের লিখিত অংশগুলো একত্র করেন। পাশাপাশি তিনি কুরআনের হাফিযগণের সাহায্যও গ্রহণ করেন। কুরআনের প্রতিটি অংশ তিনি লেখনী ও মুখস্থ এ উভয় পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে দেখেন। এভাবে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে আল-কুরআনের প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। আল-কুরআনের এ কপিটি খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর তা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের পর এ কপিটি তাঁর মেয়ে উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত থাকে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তাঁর সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ছিল বিশাল-বিস্তৃত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ও দেশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। এমনকি এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করে আল-কুরআনের একক ও প্রামাণ্য পাঠরীতি প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি হযরত যায়দ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে আরও সাতটি অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এরপর বিভিন্ন প্রদেশে আল-কুরআনের এক এক কপি পাঠিয়ে দেওয়া

হয়। ফলে পবিত্র কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মুসলমানদের অনৈক্য দূর হয়। আল-কুরআন সংরক্ষণের এরূপ অসামান্য অবদানের জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে জামিউল কুরআন বলা হয়। জামিউল কুরআন অর্থ কুরআন সংকলক বা কুরআন একত্রকারী।

দলগত কাজ : এই পাঠ পড়ে কুরআন সংকলন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে একটি সারসংক্ষেপ লিখবে।

পাঠ ২
তাজবিদ (تَجْوِيْدٌ)

তাজবিদ আরবি শব্দ। এর অর্থ সুন্দর করা, বিন্যস্ত করা, সুন্দর করে সাজানো ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায় আল-কুরআনকে শুদ্ধভাবে পাঠ করাকে তাজবিদ বলা হয়। কুরআন মজিদ পড়ার বেশ কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন : মাখরাজ, সিফাত, মাদ্দ, ওয়াক্‌ফ, গুন্নাহ ইত্যাদির নিয়ম সম্পর্কে অবগত হওয়া। এসব নিয়ম-কানুন সহকারে শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত করাকেই তাজবিদ বলা হয়। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা মাখরাজ সম্পর্কে জেনে এসেছি। এ শ্রেণিতে আমরা তাজবিদের আরও কিছু নিয়মকানুন জানব।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। এটি নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

مَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهٖ حَسَنَةٌ وَّالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ○

অর্থ : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে, সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশগুণ।' (তিরমিযি)

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ বা বর্ণ তিলাওয়াতের দশটি করে সাওয়াব লেখা হয়। যেমন-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম)-এর মধ্যে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। কেউ যদি এটি তিলাওয়াত করে তবে সে (১৯X১০) = ১৯০টি নেকি লাভ করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা পাঠকারীদের পক্ষে সুপারিশ করবে।' (মুসলিম)

কুরআন শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে তিলাওয়াতের মাধ্যমে তিলাওয়াতের এসব ফজিলত লাভ করা যায়। এজন্য তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা অত্যাবশ্যক। তাজবিদ সহকারে কুরআন পড়া আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। তিনি বলেছেন–

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

অর্থ : "আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত ৪)

তাজবিদ না জেনে কুরআন পাঠ করলে তা শুদ্ধ হয় না। আর কুরআন পাঠ শুদ্ধ না হলে নামায সঠিকভাবে আদায় হয় না। এরূপ তিলাওয়াতকারী কোনো সাওয়াবও লাভ করবে না।

সুতরাং আমরা শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করব। আর এজন্য প্রথমেই তাজবিদ শিক্ষা করব। এরপর কুরআন পাঠের সময় এ নিয়মগুলোর অনুশীলন করব।

পাঠ ৩

মাদ্দ (مَدٌّ)

মাদ্দ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা, লম্বা করা। তাজবিদের পরিভাষায় মাদ্দের হরফের ডান দিকের হরকতযুক্ত হরফ লম্বা করে পড়াকে মাদ্দ বলা হয়। যের, যবর ও পেশকে হরকত বলে।

মাদ্দের হরফ মোট তিনটি। যথা- আলিফ, ওয়াও, ইয়া (ا-و-ى)।

এ তিনটি হরফ নিম্নলিখিত অবস্থায় মাদ্দের হরফ হিসেবে উচ্চারিত হয় :

ক. ا (আলিফ)-এর পূর্বের হরফে যবর (ـَ) থাকলে। যেমন-بَا

খ. و (ওয়াও)-এর উপর জযম (ـْ) এবং তার ডান পাশের হরফে পেশ (ـُ) থাকলে। যেমন-بُوْ

গ. ى (ইয়া)-এর উপর জযম (ـْ) এবং এর ডান পাশের অক্ষরে যের (ـِ) থাকলে। যেমন-بِيْ

উপর্যুক্ত তিনটি অবস্থায় ا-و-ى মাদ্দের হরফ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে এর পূর্বের অক্ষর একটু দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

প্রকারভেদ

মাদ্দ প্রধানত দুই প্রকার। যথা –

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ)

নিম্নে এ দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

মাদ্দের হরফের ডানে বা পরে জযম (ـْ) বা হামযা (ء) কিংবা তাশদিদ (ـّ) না থাকলে তাকে মাদ্দে আসলি বলে। মাদ্দে আসলিকে মাদ্দে তাব্‌য়িও বলা হয়। এরূপ মাদ্দে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

উল্লেখ্য, একটি সোজা আঙ্গুলকে স্বাভাবিকভাবে বাঁকা করে হাতের তালুতে লাগাতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে এক আলিফ পরিমাণ সময় বলে।

মাদ্দে আসলির উদাহরণ : نُوْحِيْهَا

এ শব্দটিতে একসাথে মাদ্দে আসলির তিন ধরনের উদাহরণ রয়েছে। যেমন-

ক. نُوْ এখানে و (ওয়াও)-এর উপর জযম (ـْ) এবং তার পূর্বের হরফ ن (নুন)-এর উপর পেশ (ـُ) রয়েছে।

খ. حِيْ এখানে ى (ইয়া)-এর উপর জযম (ـْ) এবং এর পূর্বের হরফ ح (হা)-এর নিচে যের (ـِ) রয়েছে।

গ. هَا এখানে ا (আলিফ)-এর পূর্বের হরফ ه (হা)-এর উপর যবর (ـَ) রয়েছে।

এ তিনটি ক্ষেত্রেই মাদ্দের হরফ و-ى-ا এর পূর্বে বা পরে জযম (ـْ) বা, হামযা (ء) বা তাশদিদ (ـّ) নেই। সুতরাং এগুলো মাদ্দে আসলি। এরূপ অবস্থায় ن-ح-ه (নুন, হা, হা) অক্ষরকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

কুরআন মজিদের যে সকল হরফের উপর খাড়া যবর (ـٰ), নিচে খাড়া যের (ـٖ) এবং উপরে উল্টো পেশ (ـٗ) রয়েছে, সে সকল হরফকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন-

اِلٰهِ النَّاسِ

لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ

مَا لُهٗ وَمَا كَسَبَ

এখানে ل (লাম) হরফের উপর খাড়া যবর (ـٰ), ه (হা) হরফের নিচে খাড়া যের (ـٖ) এবং ه (হা) হরফের উপর উল্টো পেশ (ـٗ) রয়েছে। সুতরাং, ل-ه-ه (লাম, হা, হা) হরফগুলোকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ)

ফারঈ অর্থ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। মাদ্দে আসলি থেকে যে সকল মাদ্দ বের হয় তাকে মাদ্দে ফারঈ বলে। অর্থাৎ মাদ্দের হরফের পরে জযম (ـْ) বা হামযা (ء) বা তাশদিদ (ـّ) থাকলে সেসব স্থানে দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে মাদ্দে ফারঈ বলে।

উদাহরণ

ক. اَلْاٰنَ –এ শব্দে মাদ্দের হরফ-এর পর লাম হরফে জযম (ـْ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ। অতএব, আমরা এ স্থানে হামযাকে লম্বা করে পড়ব।

খ. جَآءَ-وَمَآ اَدْرٰكَ –এ উদাহরণ দুটিতে মাদ্দের হরফ আলিফ-এর পর হামযা এসেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জিম (ج) ও মীম (م) হরফকে মাদ্দে ফারঈ হিসেবে দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

গ. وَلَا الضَّآلِّيْنَ-كَآفَّةً –আলোচ্য উদাহরণদ্বয়ে মাদ্দের হরফ আলিফ-এর পর লাম (ل) এবং ফা (ف) হরফে তাশদিদ (ـّ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ-এর অন্যতম রূপ। এরূপ ক্ষেত্রেও হরফকে লম্বা করে পড়তে হবে।

উল্লেখ্য, আল-কুরআনের অনেক স্থানে হরফের উপর এসব মাদ্দের চিহ্ন দেওয়া থাকে। যেমন- (~), (~)। হরফের উপর এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফকে লম্বা করে পড়তে হয়। হরফের উপর (~) চিহ্ন থাকলে চার আলিফ এবং (~) চিহ্ন থাকলে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন- اُولٰٓئِكَ-مَآ اَغْنٰى

দলগত কাজ : মাদ্দের প্রকারভেদের একটি তালিকা তৈরি কর।
বাড়ির কাজ : মাদ্দের নাম ও কোন মাদ্দ কয় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয় তা লেখ।

পাঠ ৪

ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ)

ওয়াক্‌ফ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরতি দেওয়া, থামা, স্থগিত রাখা ইত্যাদি। তাজবিদের পরিভাষায় তিলাওয়াতের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে বিরতি দেওয়াকে ওয়াক্‌ফ বলে। অন্য কথায়, দুই নিঃশ্বাসের মধ্যবর্তী বিরতির সময়কে ওয়াক্‌ফ বলা হয়।

আল-কুরআন তিলাওয়াতে ওয়াক্‌ফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমরা বেশি সময় নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর আমাদের শ্বাস নিতে হয়। তিলাওয়াতের সময়ও একশ্বাসে পুরো তিলাওয়াত করা সম্ভব নয়। এজন্য আয়াতের মধ্যে থামতে হয়। আয়াতের মধ্যে এরূপ বিরতি নেওয়াই ওয়াক্‌ফ।

তাজবিদ হলো কুরআন সুন্দর ও শুদ্ধরূপে তিলাওয়াতের নাম। সুতরাং তিলাওয়াতকালে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থামা যাবে না। তাতে কুরআন তিলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। অনেক সময় অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। অতএব, নির্ধারিত স্থানে ওয়াক্‌ফ করতে হবে। আমাদের প্রিয় নবি (স.) সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতের পর ওয়াক্‌ফ করতেন। ওয়াক্‌ফ করলে শেষ হরফের উপর জযম উচ্চারণ করতে হবে। কোনো হরকত (যবর, যের, পেশ) উচ্চারণ করে থামা যাবে না। তবে কেউ অপারগ হলে বা শ্বাস রাখতে না পারলে নির্ধারিত স্থানের

পূর্বেই ওয়াক্‌ফ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তিলাওয়াত করার সময় পুনরায় যে শব্দে ওয়াক্‌ফ করেছে, সে শব্দ থেকে তিলাওয়াত করতে হবে। আল-কুরআনে ওয়াক্‌ফের নানারকম চিহ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হলো বিরাম চিহ্ন। এগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে শুদ্ধভাবে ওয়াক্‌ফ করা যায়। নিম্নে এ সমস্ত চিহ্নসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো–

○- এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াক্‌ফ তাম'। এটি বাক্য বা আয়াতের চিহ্ন। অর্থাৎ এ চিহ্ন দ্বারা আয়াত শেষ হওয়া বোঝা যায়। এ চিহ্নে থামতে হবে।

م - একে 'ওয়াক্‌ফ লাযিম' বলে। এ চিহ্নে ওয়াক্‌ফ করা অত্যাবশ্যক। এতে ওয়াক্‌ফ না করলে আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

ط - এটি 'ওয়াকফ মুতলাক'-এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নে ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।

ج - এটি 'ওয়াক্‌ফ জায়িয'-এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা কিংবা না থামা উভয়ই জায়েয। তবে এতে ওয়াক্‌ফ করা ভালো।

ز - একে 'ওয়াক্‌ফ মুজাওয়ায' বলে। এ চিহ্নে না থামা ভালো।

ص - এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াক্‌ফ মুরাখ্‌খাস'। এখানে না থামা ভালো। তবে অপারগ হলে এ স্থানে থামা যাবে।

ق - এ চিহ্নে থামা ও না থামা প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। তবে এতে না থামা ভালো।

قف - এটি ওয়াকফ্ আমর। অর্থাৎ এতে থামার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে থামা উচিত।

لا - এটি না থামার নির্দেশ। এরূপ স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়তে হবে।

صل - এ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দেওয়া বা না দেওয়া উভয়ই জায়েয। তবে বিরতি দেওয়াই উত্তম।

صلى - এ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

س/سكته - এ চিহ্নের নাম সাকতাহ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে শ্বাস ছাড়া যাবে না। অর্থাৎ পড়া বন্ধ থাকবে তবে শ্বাস জারি থাকবে।

ث/مع/معانقة - এ চিহ্নের নাম মুআনাকা। আয়াতের বা শব্দের ডানে এবং বামে (তিনবিন্দু) অথবা مع চিহ্ন থাকে। এ অবস্থায় তিলাওয়াতকালে এক স্থানে থামতে হয় এবং অপর স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়।

وقف النبى - ওয়াক্‌ফুন নাবি (স.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে প্রিয় নবি (স.) ওয়াকফ করেছিলেন।

وقف جبرائيل - ওয়াক্‌ফ জিবরাইল (আ.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দিলে বরকত লাভ হয়।

وقف غفران - ওয়াক্‌ফ গুফরান। এ স্থানে থামলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা ওয়াক্‌ফের চিহ্নসমূহের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

নাযিরা তিলাওয়াত

আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অত্যধিক। পবিত্র কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করা যায়। আবার দেখেও পাঠ করা যায়। দেখে দেখে তিলাওয়াত করাকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে। নাযিরা তিলাওয়াত একটি উত্তম ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা এরূপ তিলাওয়াতকারীকে আখিরাতে অত্যধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন। আমরাও বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

আল-কুরআন অত্যন্ত মর্যাদাবান গ্রন্থ। সুতরাং অত্যন্ত আদবের সাথে এ কিতাব তিলাওয়াত করা উচিত। আল-কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে দেওয়া হলো–

ক. পূর্ণরূপে ওযু করে পাক-পবিত্র জায়গায় বসা।

খ. পবিত্র কুরআনকে উঁচু কোনো কিছুর উপর রাখা।

গ. মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করা। কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা না করা।

ঘ. ধীরে ধীরে তাজবিদের সাথে তিলাওয়াত করা।

ঙ. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিলাওয়াত করা।

শ্রেণির কাজ

- এ শ্রেণিতে নাযিরা তিলাওয়াতের পাঠ হলো– সূরা আল-বাকারার পঞ্চম রুকু থেকে অষ্টম রুকু পর্যন্ত।
- শিক্ষক প্রথমে দেখে দেখে শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি–তামাশা, হট্টগোল করবে না।
- এরপর শিক্ষার্থীরা একেকজন করে তিলাওয়াত করবে। শিক্ষক তা শুনবেন। কারো কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষকের নির্দেশনামতো শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভুলগুলো ঠিক করে নেবে।
- অতঃপর শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে পুনরায় তিলাওয়াত করবে এবং শিক্ষক শুনবেন। শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধরূপে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শিখবে। অতঃপর বাড়িতে নিয়মিত তিলাওয়াতের অভ্যাস করবে।

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআনের কতিপয় সূরা

পাঠ ৬

সূরা আল-আদিয়াত (سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ)

সূরা আল-আদিয়াত পবিত্র কুরআনের ১০০তম সূরা । এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় প্রথম শব্দ আল- আদিয়াত। এ শব্দ থেকেই এ সুরার নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরায় আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ১১টি। তৎকালীন আরবে যখন এক ভয়ংকর অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল, আরবের গোত্রসমূহ পরস্পর রক্তপাত ও লুণ্ঠনে নিয়োজিত ছিল, কোনো গোত্রই নিরাপদে ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় একথা স্মরণ করে দেওয়ার জন্য যে, ধন-সম্পদের লোভে অন্যায় অসৎ কর্ম করলে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

শব্দার্থ

وَ	-	শপথ, কসম	كَنُوْدٌ	-	অকৃতজ্ঞ
الْعٰدِيٰتِ	-	ধাবমান অশ্বরাজি	شَهِيْدٌ	-	সাক্ষী, অবহিত
ضَبْحًا	-	ঊর্ধ্বশ্বাসে	حُبِّ	-	ভালোবাসা, আসক্তি
فَالْمُوْرِيٰتِ	-	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণকারী	خَيْرِ	-	ভালো, কল্যাণ, ধন-সম্পদ
قَدْحًا	-	ক্ষুরাঘাতে, ক্ষুরের আঘাতে	شَدِيْدٌ	-	কঠোর, কঠিন, প্রবল
الْمُغِيْرٰتِ	-	হামলাকারী, আক্রমণকারী, অভিযানকারী	بُعْثِرَ	-	উত্থিত হবে, উঠানো হবে
صُبْحًا	-	প্রত্যুষে, প্রভাতে, প্রভাতকালে	حُصِّلَ	-	প্রকাশ করা হবে
اَثَرْنَ	-	উৎক্ষিপ্ত করে	الصُّدُوْرِ	-	অন্তরসমূহ, বক্ষসমূহ
نَقْعًا	-	ধূলি	خَبِيْرٌ	-	অবহিত, সর্বজ্ঞাত
وَسَطْنَ	-	মধ্যে ঢুকে পড়ে			

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ

১. শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির।

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ

২. যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ

৩. যারা প্রভাতকালে অভিযান চালায়।

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ

৪. আর সে সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ

৫. অতঃপর শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ

৬. নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ

৭. আর সে এ বিষয়ে অবশ্যই অবহিত।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۙ

৮. এবং নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ

৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয়, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে?

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ

১০. এবং অন্তরে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করা হবে?

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۙ

১১. সেদিন তাদের কী হবে, সে সম্পর্কে তাদের প্রতিপালক অবশ্যই সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা

এ সূরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সামরিক অশ্বের নানা গুণ বর্ণনা এবং এগুলোর শপথ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের দুটি বিশেষ স্বভাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো–

ক. স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

খ. সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা।

আর মানুষ স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে এ দুটি কাজ করে থাকে। অথচ এগুলো মানুষের করা একেবারেই অনুচিত।

এজন্য সূরার শেষ পর্যায়ে মানুষকে আখিরাত ও কবরের জীবনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ কি জানে না যে তাকে কবরে যেতে হবে। অতঃপর কিয়ামতে তাদের সকল কার্যকলাপ প্রকাশ করা হবে। এমনকি সে অন্তরে যেসব অকৃতজ্ঞতা ও লোভ-লালসা পোষণ করত, তাও প্রকাশ করা হবে। পরিশেষে সমস্ত কিছুর বিচার করা হবে। আর সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা খুব ভালোভাবেই অবহিত। সুতরাং মানুষের উচিত সকল অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতা ত্যাগ করে সৎপথে জীবনযাপন করা।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা লাভ করি :

- নিঃসন্দেহে মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।
- ধন-সম্পদের প্রতিও মানুষের আসক্তি প্রবল।
- আখিরাতে মানুষের অন্তরের গোপন বিষয়ও প্রকাশ করা হবে।
- অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মানুষের চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

অতএব, আমরা সর্বদা এ সূরার শিক্ষা মনে রাখব। আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব। কখনোই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবো না। সাথে সাথে ধন-সম্পদের লোভে পড়ে অন্যায় ও অসৎ কাজ করব না। বরং আখিরাতে জবাবদিহি করার কথা স্মরণ রেখে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করব।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সুরা আদিয়াতের তিনটি শিক্ষা খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

সূরা আল-কারিআহ (سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ)

সূরা আল-কারিআহ মাক্কি সূরাসমূহের মধ্যে অন্যতম। এটি পবিত্র কুরআনের ১০১তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১টি।

এ সূরার প্রথম শব্দ আল-কারিআহ। কারিআহ অর্থ সজোরে আঘাতকারী। কিয়ামত বা মহাপ্রলয় পৃথিবীকে সজোরে আঘাত করবে বলে একে কারিআহ বলা হয়। এ সূরায় কিয়ামতের নানা অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-কারিআহ বা মহাপ্রলয়।

তৎকালীন আরবে মানুষ যখন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, লুটতরাজ ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল তখন তাদেরকে কিয়ামতের মহাপ্রলয় এবং হাশরের বিচার ও দোযখের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।

শব্দার্থ

اَلْقَارِعَةُ	-	মহাপ্রলয়, সজোরে আঘাতকারী	مَوَازِيْنُ	-	পাল্লাসমূহ, পরিমাপ দণ্ডগুলো
يَوْمَ	-	দিন	عِيْشَةٍ	-	জীবন, জীবিকা
اَلْفَرَاشِ	-	পতঙ্গ	رَاضِيَةٍ	-	সন্তোষজনক
اَلْمَبْثُوْثِ	-	বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো-ছিটানো	خَفَّتْ	-	হালকা হবে
اَلْجِبَالُ	-	পর্বতসমূহ	اُمُّ	-	স্থান, জায়গা, ঠিকানা
اَلْعِهْنِ	-	রঙিন পশম	هَاوِيَةٌ	-	হাবিয়া, গভীর গর্ত, এটি একটি জাহান্নামের নাম
اَلْمَنْفُوْشِ	-	ধুনিত	نَارٌ	-	আগুন
ثَقُلَتْ	-	ভারী হবে	حَامِيَةٌ	-	উত্তপ্ত, প্রজ্বলিত, জ্বলন্ত

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلْقَارِعَةُ ۙ

১. মহাপ্রলয়।

مَا الْقَارِعَةُ ۙ

২. মহাপ্রলয় কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ

৩. আপনি কি জানেন মহাপ্রলয় কী?

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ

৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۚ

৫. আর পর্বতসমূহ ধুনিত রঙিন পশমের মতো হবে।

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

৬. অতঃপর সেদিন যার পাল্লা ভারী হবে।

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۚ

৭. সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন।

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে।

فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۚ

৯. তার স্থান হবে হাবিয়া।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۚ

১০. আপনি কি জানেন তা কী?

نَارٌ حَامِيَةٌ ۚ

১১. তা অতি উত্তপ্ত আগুন।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-কারিআহতে আল্লাহ তায়ালা দুই ধরনের বিষয় উল্লেখ করেছেন। সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কিয়ামতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করবেন। এজন্য এ সূরায় তিনি আল-কারিআহ বা মহাপ্রলয় শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সেদিন এ পৃথিবীর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বড় বড়

পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত সেদিন ধুনিত পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। মানুষ কীটপতঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আসমান, জমিন, সাগর, নদী, বন-জঙ্গল সবকিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন শুধু আল্লাহ তায়ালা থাকবেন। তিনি ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ সূরায় দ্বিতীয় পর্যায়ে শেষ ৬টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার কাজকর্মের পরিণতি বর্ণনা করেছেন। হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষের হিসাবনিকাশ নেওয়া হবে। মানুষের পাপপুণ্য পাল্লায় ওজন করা হবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি পুণ্য বা নেক কাজ করবে, তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে। সে লাভ করবে চিরশান্তির জান্নাত। সে সেখানে সন্তুষ্ট চিত্তে বসবাস করবে। অপরদিকে যার পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে তার পাপের পাল্লা ভারী হবে। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হাবিয়া নামক দোযখ হবে তার বাসস্থান। হাবিয়া খুবই গভীর স্থান। এতে রয়েছে উত্তপ্ত আগুন। সেখানে পাপীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

শিক্ষা :

- এ দুনিয়ার জীবন ও দুনিয়া উভয়ই ক্ষণস্থায়ী।
- মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা গোটা দুনিয়া ও সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন।
- হাশরে মানুষের ভালোমন্দের বিচার করা হবে।
- নেককার ব্যক্তির স্থান হবে চিরশান্তির জান্নাত।
- আর পাপীদের ঠিকানা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জাহান্নাম।

আমরা এ সূরাটি অর্থসহ মুখস্থ করব। এ সূরার শিক্ষা অনুসারে সর্বদা ভালো কাজ করব। অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকব।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আল-কারিআহর শিক্ষাগুলো লিখে বাড়ি থেকে একটি পোস্টার তৈরি করে নিয়ে আসবে।

পাঠ ৮

সূরা আত-তাকাসুর (سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ)

এ সূরার প্রথম আয়াতে বর্ণিত তাকাসুর শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আত-তাকাসুর। এটি পবিত্র কুরআনের ১০২তম সূরা। এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি।

রাসুলুল্লাহ (স.) একদা সাহাবিগণকে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ক্ষমতা কারো নেই যে সে দৈনিক এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে। উত্তরে তারা বললেন, হ্যাঁ এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনেরই বা আছে? অতঃপর রাসুল (স.) বললেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন সূরা তাকাসুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য, প্রতিদিন এই সূরা একবার পাঠ করা এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সমান। (মাযহারি)

শানে নুযুল

কুরাইশের শাখাগোত্র ছিল বনু আবদি মানাফ, বনু কুসাই ও বনু সাহম। এদের প্রত্যেক গোত্র অপর গোত্রকে লক্ষ্য করে বলত, কি নেতৃত্ব, কি ক্ষমতা কিংবা জনসংখ্যা সবদিক থেকেই আমরা তোমাদের উপরে। এতে করে প্রথমে বনু আবদি মানাফই সবার উপরে প্রমাণিত হলো। শেষে সবাই বলল, আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছে তাঁদেরকেও হিসাব করব। কাজেই তারা কবরস্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং কোনটা কার কবর তা বলে বলে গুনতে শুরু করল। এবার বনু সাহমের সংখ্যায় তিন পরিবার বেশি হলো। কেননা জাহিলি যুগে তাঁদের জনসংখ্যা বেশি ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই সুরা নাজিল হয়।

শব্দার্থ

اَلْهٰكُمُ	-	তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করেছে, মোহাবিষ্ট করেছে	لَوْ	-	যদি
اَلتَّكَاثُرُ	-	প্রাচুর্য, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	عِلْمَ	-	জ্ঞান
حَتّٰى	-	পর্যন্ত, যতক্ষণ না, এমনকি	اَلْيَقِيْنِ	-	দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চিত
زُرْتُمُ	-	তোমরা সাক্ষাৎ করেছ, তোমরা উপনীত হয়েছ, তোমরা মুখোমুখি হয়েছ।	اَلْجَحِيْمَ	-	জাহিম, একটি জাহান্নামের নাম
اَلْمَقَابِرَ	-	কবরসমূহ	عَيْنَ	-	চক্ষু, চোখ
كَلَّا	-	কখনোই না	يَوْمَئِذٍ	-	সেদিন
سَوْفَ	-	অচিরেই, শীঘ্রই	عَنِ	-	হতে, থেকে, সম্পর্কে
تَعْلَمُوْنَ	-	তোমরা জানবে	اَلنَّعِيْمِ	-	নিয়ামত
ثُمَّ	-	অতঃপর, আবার			

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। (এমনকি এ অবস্থায় তোমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যাও)

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

৩. এটা সংগত নয়, তোমরা অচিরেই তা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪. আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

৫. সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝

৭. আবার বলি, তোমরা তা অবশ্যই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে দেখবে।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

৮. অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ব্যাখ্যা

এ সুরায় ধন-সম্পদের মোহ ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ইত্যাদির প্রতি লোভী। প্রাচুর্য লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই মানুষের মৃত্যু এসে যায়। অথচ সে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কোনো প্রস্তুতিই নিতে পারে না। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা ধন-সম্পদ হলো ক্ষণস্থায়ী বিষয়। এগুলোর প্রতি মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ আখিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ এগুলোর তুলনায় কতোইনা উত্তম। মানুষের উচিত দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া। মানুষ যদি আখিরাতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করত তবে কখনোই দুনিয়ার প্রাচুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতো না।

মৃত্যুর পর মানুষ আখিরাতকে বুঝতে পারবে। আখিরাতের নানা বিষয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। অথচ সে তখন কিছুই করতে পারবে না। বরং দুনিয়ায় প্রাপ্ত নিয়ামত সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। দুনিয়ার লোভ-লালসা ও অন্যায়-অনৈতিকতার জন্য সে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।

শিক্ষা :

- সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকা উচিত নয়।
- এটি মানুষকে আখিরাত ভুলিয়ে দেয়।
- অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ উপার্জনকারী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।
- আখিরাতে সকল কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

অতএব, আমরা ধন-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা করব না। বরং বৈধভাবে প্রয়োজনমতো ধন-সম্পদ উপার্জন করব। আর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনামতো খরচ করব। অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা করব না।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আত-তাকাসুরের শানে নুযুল পাশের বন্ধুকে বলবে।
বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আত-তাকাসুরের শিক্ষাগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ৯

সুরা আল-লাহাব (سُوْرَةُ اللَّهَبِ)

সুরা আল-লাহাব মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সূরায় আবু লাহাবের চরিত্র ও পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা লাহাব। এটি আল-কুরআনের ১১১তম সূরা।

শানে নুযুল

একদা রাসুলুল্লাহ (স.) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশদের ডাক দিলেন। তৎকালীন সময়ে আরবে বিপদাপদের ক্ষেত্রে এভাবে আহ্বান করার প্রচলন ছিল। তাই রাসুল (স.)–এর ডাকে সকলেই পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলো। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি যদি বলি যে এ পাহাড়ের অপর পাশে একটি শত্রুদল তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যেকোনো সময় তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলেই সমস্বরে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব। এরপর রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তোমাদের এক ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি। (তোমরা স্বীকার কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ কর।) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এ দাওয়াত শুনে আবু লাহাব বলে উঠল–

تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا

অর্থ : 'তোমার ধ্বংস হোক। এজন্যই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ?'

অতঃপর আবু লাহাব রাসুল (স.)-কে পাথর মারতে উদ্যত হয়। আবু লাহাবের এ কথা ও কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। (সহিহ্ বুখারি)

শব্দার্থ

تَبَّتْ	- ধ্বংস হোক, বিনষ্ট হোক।	ذَاتَ لَهَبٍ	- লেলিহান, শিখাযুক্ত
يَدَا	- দুইহাত	اِمْرَاَتُهٗ	- তার স্ত্রী
يَدٌ	- হাত	حَمَّالَةَ	- বহনকারিণী
مَآ اَغْنٰى	- কোনো কাজে আসেনি, কোনো উপকার আসেনি, রক্ষা করেনি	اَلْحَطَبِ	- কাঠ, লাকড়ি, ইন্ধন
كَسَبَ	- সে উপার্জন করেছে	جِيْدِ	- গলা

سَيَصْلٰى - সে অচিরেই প্রবেশ করবে
نَارًا - আগুন, দোযখ
حَبْلٌ - রশি, ফাঁস, রজ্জু
مَسَدٍ - পাকানো, প্যাঁচানো

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝

১. আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝

২. তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে তা কোনো কাজে আসেনি।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

৩. শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।

وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

৪. এবং তার স্ত্রীও (প্রবেশ করবে) যে ইন্ধন বহন করে।

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

৫. তার গলায় পাকানো রশি।

ব্যাখ্যা

আবু লাহাব ছিল ইসলাম ও নবি করিম (স.)-এর শত্রু। সে সর্বদাই ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। এ সূরায় তার শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আবু লাহাব ছিল রাসুল (স.)-এর চাচা। মক্কা নগরীতে সে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। সে প্রচুর ধন-সম্পদেরও মালিক ছিল। কিন্তু এত কিছুও তার কোনো কাজে আসেনি। বরং দুনিয়াতেও আবু লাহাবের ধ্বংস। আর আখিরাতেও সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তার স্ত্রীও ছিল তারই মতো ইসলামের শত্রু। সেও রাসুল (স.)-কে কষ্ট দিত। সে রাসুল (স.)–এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। ফলে তার প্রতিও আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ রয়েছে এবং আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

শিক্ষা

- রাসুলুল্লাহ (স.) ও ইসলামের বিরোধিতা খুবই মারাত্মক কাজ।
- এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের ধ্বংস অনিবার্য।
- দুনিয়ার মানসম্মান, ধন-সম্পদ ইসলামের এসব শত্রুকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আল-লাহাবের শিক্ষাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১০

সূরা আল-ইখলাস (سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ)

সূরা আল-ইখলাস আল-কুরআনের ১১২তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৪টি। এ সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এ সূরার ফজিলত অত্যন্ত বেশি। মহানবি (স.) বলেছেন, এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)। অন্য একটি হাদিসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসুল (স.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এ সুরাটি খুব ভালোবাসি। উত্তরে নবি করিম (স.) বললেন, এর ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (জামি তিরমিযি)

শানে নুযুল

একবার মক্কার মুশরিকরা মহানবি (স.)-এর নিকট আল্লাহ তায়ালার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। (জামি তিরমিযি)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল আল্লাহ তায়ালা কীসের তৈরি- স্বর্ণ, রৌপ্য না অন্য কিছুর? তাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এ সুরা নাজিল করেন।

শব্দার্থ

قُلْ - আপনি বলুন, তুমি বলো
هُوَ - তিনি, সে।
اَحَدٌ - একক, এক-অদ্বিতীয়।
اَلصَّمَدُ - অমুখাপেক্ষী, বে-নিয়ায, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ং সম্পূর্ণ।
لَمْ يَلِدْ - তিনি কাউকে জন্ম দেননি
لَمْ يُوْلَدْ - তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি
كُفُوًا - সমতুল্য, সাদৃশ্যপূর্ণ, সমকক্ষ।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ

১. বলুন, (হে নবি!), তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ

২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সকলেই তার মুখাপেক্ষী)।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۙ

৪. আর তার সমতুল্য কেউই নেই।

ব্যাখ্যা

এ সূরা তাওহিদ বা একত্ববাদের সুপ্রসিদ্ধ দলিল। এ সূরায় সংক্ষিপ্তরূপে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে মুশরিক ও কাফিরদের বিশ্বাসের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবকিছু তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন এবং একাই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। বরং সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তার মুখাপেক্ষী। আর তার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। বিশ্বজগতে তার সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউই নেই।

শিক্ষা

- আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়।
- তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতামাতা কেউ নেই।
- তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান।
- তার সমকক্ষ কেউ নেই।

আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করব। তার সাথে কাউকে শরিক করব না।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আল-ইখলাসের শিক্ষাগুলো লিখে একটি রঙিন পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১১

মুনাজাতমূলক আয়াত

আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও রক্ষক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি আমাদের আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য ইত্যাদি দান করেন। পৃথিবীর সকল নিয়ামত তারই দান। তিনি আমাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তার দয়া ও করুণাতেই আমরা দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা পাই। এককথায় সকল কিছু তারই অধীন। তার হুকুমেই সবকিছু পরিচালিত হয়। পার্থিব জীবনে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তাও তিনি দান করেন।

সুতরাং আমাদের উচিত তারই কাছে সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করা। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন।' (জামি তিরমিযি)। আল্লাহ তায়ালার নিকট কিছু চাওয়ার মাধ্যম হলো মুনাজাত করা। মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের চাহিদা জানাতে পারি। আল-কুরআনে মুনাজাতমূলক বহু আয়াত রয়েছে। এ পাঠে আমরা এরূপ তিনটি মুনাজাতমূলক আয়াত শিখব। অতঃপর এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট মুনাজাত করব।

আয়াত ১

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ২৩)

সর্বপ্রথম এ মুনাজাত হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে বসবাস করতে নির্দেশ দেন। জান্নাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে সকল নিয়ামত ভোগ করার অনুমতি দেন। শুধু একটি নির্দিষ্ট গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেন। কিন্তু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) শয়তানের প্ররোচনায় ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। তাঁদের এ কাজের জন্য মহান আল্লাহ বেহেশত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। দুনিয়ায় এসে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন। তাঁরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের উপর্যুক্ত মুনাজাত শিক্ষা দেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এ মুনাজাতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

এ আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুনাজাত। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা নানারকম পাপ করে থাকি। আমরা আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে থাকি। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত অপরাধসমূহ স্বীকার করা। অতঃপর এ মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহলে আশা করা যায়

আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং আমাদের পাপ মাফ করে দেবেন।

আয়াত ২

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ○

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদের প্রতি দয়া কর এবং আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা কর।" (সূরা আল-কাহ্ফ, আয়াত ১০)

মুনাজাতটি আসহাবে কাহফের যুবকগণ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহ্ফে তাঁদের ঘটনা ও মুনাজাত উল্লেখ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.)-এর আগমনের কয়েকশ বছর পূর্বের ঘটনা। দাকইয়ানুস নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে ইমানদারদের উপর খুব অত্যাচার করত। তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকজন যুবক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাঁদের সাথে একটি কুকুরও ছিল। তাঁদেরকে আসহাবে কাহ্ফ বলা হয়। তাঁরা গুহাতে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। গুহায় থাকাবস্থায় তাঁরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করে এ মুনাজাত করেন। আল্লাহ তায়ালাও তাঁদের দোয়া কবুল করেন।

নেককার ও পুণ্যবানগণ কখনোই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ত্যাগ করেন না। শত অত্যাচারেও তাঁরা যথাযথভাবে মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। এজন্য প্রয়োজনে নিজেদের ঘরবাড়ি, দেশত্যাগ করতেও পিছপা হন না। আমরাও তাঁদের মতো আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ছাড়ব না। বরং কোনো অসুবিধা দেখা দিলে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব। ফলে তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমাদের সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবেন।

আয়াত ৩

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।" (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

এ মুনাজাত করেছিলেন হযরত ইবরাহিম (আ.)। কাফিরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট এ মুনাজাত করেন।

বস্তুত, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর মালিক। তার দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা কোনো কিছু করতে পারব না। সুতরাং সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সকল অবস্থায় আমরা আল্লাহ তায়ালার দয়ার উপর নির্ভর করব। সকল কাজে তাঁরই অভিমুখী হবো। তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাহায্য করবেন। উক্ত মুনাজাত আমাদের এ শিক্ষা প্রদান করে।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি অর্থসহ একে অন্যকে মুখস্থ বলবে।
বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখার জন্য সুন্দর করে লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১২
আল-হাদিস (اَلْحَدِيْثُ)

হাদিস আরবি শব্দ। এর অর্থ কথা, বাণী ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলা হয়।

হাদিসের গুরুত্ব

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতেন। হাতে-কলমে পুণ্য ও ন্যায় কাজের শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির আদর্শ। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তাঁর পর আর কোনো নবি আসবেন না। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শই কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং তাঁর সকল কথা ও কর্ম সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। এগুলো জানার মাধ্যমেই আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। হাদিস শরিফ হলো নবি করিম (স.)-এর জীবনের সকল কাজ-কর্মের সংরক্ষক। এর মাধ্যমেই আমরা মহানবি (স.)-এর সকল নির্দেশনা ও শিক্ষা জানতে পারি।

যদি হাদিস শরিফ না থাকত, তবে আমরা এসব কিছু জানতে পারতাম না। সুতরাং পুণ্য ও ন্যায়ের পথে চলার জন্য হাদিস শরিফের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হাদিস ইসলামি জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস। আল-কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। হাদিস আল-কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বহু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মহানবি (স.) সেগুলো আমাদের সামনে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সেসব বিধান সাহাবিগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। হাদিস জানার মাধ্যমেই আমরা এগুলো জানতে পারি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

অর্থ : "রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশ্‌র, আয়াত ৭)

মানবজাতিকে সুপথে পরিচালিত করার বাস্তব নির্দেশনা রয়েছে হাদিসে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অর্থ: আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যদি তা শক্তভাবে ধরে রাখো তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তার নবির সুন্নাহ বা হাদিস। (মুয়াত্তা মালিক)

আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে হাদিসের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। অতএব, আমরা হাদিস শরিফ জানব এবং সে অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করতে চেষ্টা করব।

সিহাহ সিত্তাহ (اَلصِّحَاحُ السِّتَّةُ)

সিহাহ শব্দের অর্থ শুদ্ধ, সঠিক। আর সিত্তাহ শব্দের অর্থ ছয়। বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সহিহ্ হাদিসসমূহ এ ছয়টি গ্রন্থে একত্র করা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে আমরা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে মহানবি (স.)-এর হাদিসসমূহ জানতে পারি।

নিম্নে আমরা উক্ত ছয়টি হাদিস গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব :

১. সহিহ্ বুখারি

এ গ্রন্থের সংকলক হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল বুখারি (র.)। তিনি ইমাম বুখারি নামে খ্যাত। তাঁর নামানুসারেই তাঁর সংকলিত কিতাবকে সহিহ্ বুখারি বলা হয়। তিনি সর্বমোট ছয় লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর কিতাব সংকলন করেন। সহিহ্ বুখারি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ। বলা হয়, কুরআন মজিদের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো সহিহ্ বুখারি।

২. সহিহ্ মুসলিম

এটি সিহাহ সিত্তাহর দ্বিতীয় গ্রন্থ। বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহিহ্ বুখারির পরই এর স্থান। এ গ্রন্থের সংকলক হলেন আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল কুশাইরি (র.)। তিনি তিন লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করেন।

৩. জামি তিরমিযি

এ কিতাবের সংকলক আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযি (র.)। এ কিতাবে প্রায় সব বিষয়ের হাদিস সংকলন করা হয়েছে। এ কিতাব সম্পর্কে বলা হয়- 'যার ঘরে এ কিতাব থাকবে, মনে করা যাবে যে তার ঘরে নবি করিম (স.) আছেন এবং তিনি নিজে কথা বলছেন।'

৪. সুনানু আবু দাউদ

এ কিতাবের সংকলকের নাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনু আশআছ (র.)। এ কিতাবের বিন্যাস পদ্ধতি অত্যন্ত উন্নতমানের। সর্বমোট পাঁচ লক্ষ হাদিস যাচাই-বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করা হয়।

৫. সুনানু নাসাই

এর সংকলক আহমদ ইবনু শুআইব আন-নাসাই (র.)। এর বিন্যাস পদ্ধতি উঁচুমানের। সিহাহ সিত্তাহের মধ্যে এ কিতাব খানার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

৬. সুনানু ইবনু মাজাহ

এটি সিহাহ সিত্তাহের সর্বশেষ কিতাব। এর সংকলকের নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ।

আমরা বড় হয়ে হাদিসের এসব কিতাব পড়ব। এগুলো থেকে প্রিয় নবি (স.)-এর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান-লাভ করব। অতঃপর এগুলোর শিক্ষা অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করবে।
বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ ও এগুলোর সংকলকগণের নাম নিজ খাতায় লিখে একটি চার্ট তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস

মুনাজাত হলো আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করা। মুনাজাত করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মহত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা যে ব্যক্তি দুর্বল, অসহায় সে-ই সাধারণত সাহায্য চায়। আর সাহায্যকারী স্বভাবতই ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর নিকট মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আমাদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করি। সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার অমুখাপেক্ষিতা, ক্ষমতা, দয়া ইত্যাদি গুণের স্বীকৃতি প্রদান করি। সুতরাং মুনাজাতও একপ্রকার ইবাদত। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। হাদিস শরিফে মুনাজাতমূলক বহু হাদিস রয়েছে। নিম্নে আমরা মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস জানব।

হাদিস ১

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى -

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হিদায়াত (সরল সঠিক পথের নির্দেশনা), তাকওয়া বা পরহেযগারি, পবিত্রতা ও অভাব-অনটন থেকে মুক্তি কামনা করছি।' (সহিহ্ মুসলিম ও জামি তিরমিযি)

হাদিস ২

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ -

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, আমাকে (সরল সঠিক) পথ দেখাও, আমাকে সুস্থ রাখ এবং আমাকে রিজিক দান কর।' (সহিহ মুসলিম)

হাদিস ৩

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ -

অর্থ : 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দীনের (ইসলামের) উপর দৃঢ় রাখ।' (জামি তিরমিযি)

দীনের উপর দৃঢ়-স্থির থাকা মুমিনের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। উল্লিখিত হাদিসে আল্লাহ তায়ালার নিকট এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

আমরা উপরিউক্ত মুনাজাতসমূহ শিখব। এগুলোর অর্থ জানব। অতঃপর এগুলোর দ্বারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করব। তাহলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন। আমাদের ক্ষমা করবেন এবং দয়া করবেন। এভাবে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিসের অর্থ একটি পোস্টারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৪

নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক তিনটি হাদিস

মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতা দুটি মহৎ গুণ। আমাদের সমাজে নানারকম লোকজন বসবাস করে। ধনী-গরিব, সাদা- কালো, সুস্থ-অসুস্থ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবরকমের লোকদের নিয়েই আমাদের সমাজ। সবাই এ সমাজের সদস্য। সবার মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সবার মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা না থাকলে কোনো সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। আর এর জন্য প্রয়োজন মানুষের প্রতি প্রীতি, দয়া-মায়া, ভালোবাসা। ইসলাম ধর্মে এগুলোর প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমাদের মহানবি (স.) নিজে সকল মানুষকে ভালোবাসতেন। জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকেই তিনি ভালোবাসতেন, সবার প্রতি দয়া করতেন। আমাদের তিনি এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরিফে আমরা তাঁর এসব নির্দেশ দেখতে পাই।

আমাদের সমাজে মুসলমানগণের পাশাপাশি অমুসলিমগণও বসবাস করে। তারাও আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। তাঁদের প্রতিও সদাচরণ করতে হবে। তাঁদের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি কোনোরূপ ঠাট্টা-তামাশা করা যাবে না। তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে দিতে হবে। এটাই হলো মহানবি (স.) ও দীন ইসলামের শিক্ষা। হাদিস শরিফে এ সম্পর্কেও আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ পাঠে আমরা মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতা-সংক্রান্ত তিনটি হাদিস জানব।

হাদিস ১

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ -

অর্থ : 'যে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তায়ালাও তার প্রতি দয়া করেন না।' (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)

শিক্ষা

পৃথিবীর সকল মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি। সকলের প্রতিই সদাচার করতে হবে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি দয়া-মায়া, ভালোবাসা দেখাতে হবে। এমন যেন না হয় যে আমরা শুধু ধনীদের ভালোবাসব, গরিবদের ভালোবাসব না। তদ্রূপ অমুসলিমদেরকে বাদ দিয়ে শুধু মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও ঠিক নয়। বরং প্রয়োজন অনুসারে সকলের প্রতিই দয়া, ভালোবাসা ও সহযোগিতা করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন এবং আমাদের প্রতি দয়া করবেন। সকল মানুষকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করাই এ হাদিসের শিক্ষা।

হাদিস ২

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ -

অর্থ : 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)

শিক্ষা

আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। মা-বাবা, ভাই-বোন, খালা-খালু, ফুফু-ফুফা, দাদা-দাদি, নানা-নানি সকলেই আমাদের আত্মীয়। তারা আমাদের একান্ত আপনজন। এছাড়া আমাদের আরও বহু আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। সকলের সাথেই আমরা সম্পর্ক রক্ষা করে চলব। কারো সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করব না।

আত্মীয়-পরিজন যদি অমুসলিমও হন তাঁদের সাথেও সম্পর্ক ত্যাগ করা যাবে না। বরং তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সদাচার করতে হবে। প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। বিপদে-আপদে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমরা সকল আত্মীয়ের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখব। তবেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।

হাদিস ৩

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থ : 'সাবধান! কেউ যদি কোনো যিম্মির প্রতি যুলুম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতাবহির্ভূত কোনো কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার থেকে কোনো মালামাল নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার (যিম্মির) পক্ষ অবলম্বন করব।' (আবু দাউদ)

শিক্ষা

মুসলিম-অমুসলিম সকলেই এ দেশের নাগরিক। মুসলিম-অমুসলিমগণের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না।

তাদের ধর্ম, জীবন, ধন-সম্পদ, সম্ভ্রম ইত্যাদির ক্ষতি করা যাবে না। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপালনে তাদের কোনোরূপ বাধা দেওয়া যাবে না। তাদের ধর্ম নিয়ে কোনোরূপ অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করলে, কষ্ট দিলে স্বয়ং নবি করিম (স.) কিয়ামতের দিন আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন না। আর মহানবি (স.) কারো পক্ষে সুপারিশ না করলে তার ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং আমরা সকল মানুষকে ভালোবাসব। কাউকে কষ্ট দেবো না, কারো প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন করব না। সমাজের সকলকে ধর্ম পরিচয়ে নয়, মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে সকলের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখব।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী এ পাঠে উদ্ধৃত হাদিস তিনটি অর্থসহ মুখস্থ বলবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাদ্দের হরফ কয়টি?

ক. ৩টি খ. ৬টি
গ. ১৪টি ঘ. ১৫টি

২. তোমরা কুরআন পাঠ কর, কেননা কুরআন পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে। হাদিসের উদ্দেশ্য–

i. কুরআন পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করা
ii. তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করা
iii. নিজে কুরআন শিক্ষা করা ও অপরকে শেখানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

এরফান নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু তার তিলাওয়াত শুদ্ধ হয় না। একবার نُوْحٌ (নুহুন) শব্দ তিলাওয়াতের সময়ে ن (নুন) বর্ণকে টেনে পড়েনি।

৩. এরফান এক্ষেত্রে কি ত্যাগ করেছে?

ক. ওয়াক্‌ফ খ. মাদ্দ

গ. মাখরাজ ঘ. সিফাত

৪. এরফানের এ জাতীয় তিলাওয়াতে —

i. সালাত শুদ্ধ হবে না

ii. অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে

iii. গুনাহ হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নাবিহা প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করে। মেয়ের তিলাওয়াত শোনার জন্য বাবা মাওলানা আহমাদ সাহেব নাবিহার কাছে বসলেন। নাবিহা তিলাওয়াত শুরু করল। তিলাওয়াতের সময়ে مٌ (মিম) চিহ্নে বিরতি দেয়নি, فِيْهَا (ফিহা) তিলাওয়াতের সময়ে ف বর্ণ এবং هـ বর্ণ (তাজবিদ অনুযায়ী) সঠিক নিয়মে পড়েনি। মেয়েকে উদ্দেশ্য করে নাবিহার বাবা বললেন, কুরআন তিলাওয়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন।

(ক) মাখরাজ কী?

(খ) নাযিরা তিলাওয়াত বলতে কী বোঝায়?

(গ) নাবিহা দ্বিতীয় পর্যায়ে তাজবিদের কোন নিয়মটি ত্যাগ করেছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) নাবিহাকে তাঁর বাবা যে বিষয়টির প্রতি তাগিদ দিয়েছেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২। আকরাম সাহেব একজন বিশিষ্ট সমাজপতি। একদিন তার অসুস্থ প্রতিবেশী মনির মিয়া চিকিৎসার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য চাইলে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেন। অপরদিকে আকরাম সাহেবের বন্ধু আফজাল সাহেব তার অসহায় ফুপাতো বোনের বিয়ের যাবতীয় খরচ বহন করেন।

(ক) সিহাহ সিত্তাহ কী?

(খ) মানবপ্রেম একটি মহৎ গুণ- ব্যাখ্যা কর।

(গ) সাহায্য প্রার্থী মনির মিয়ার প্রতি আকরাম সাহেবের আচরণে কী লজ্জিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) আফজাল সাহেবের কাজটি পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।